

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ-পরিচয়: কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের কমলনামা

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমেদ মাওলা
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.14
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.14
Pages	১৯৯-২০৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের *কমলনামা*

আহমেদ মাওলা*

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যতিক্রমধর্মী এবং বিপরীত মেরুর লেখক ছিলেন। নিজের লেখার জন্য একজন লেখক আলাদা একটি ভাষাভঙ্গি তৈরি করে লিখেছেন, এ রকম উদাহরণ খুব বেশি নেই। বাংলা চলিত ভাষার প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ধারার বিপরীতে তিনি অনেকটা বিদ্রোহী হয়ে সাধুগদ্যভাষায় লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। কেবল সাধু ক্রিয়াপদের বদলই নয়, বাক্যগঠনও জটিল থেকে জটিল হয়েছে, ব্যাকরণের কোনো বিধির ধারও ধারেননি তিনি। কিন্তু কমলকুমার মজুমদারের ভাষা অলঙ্কারবহুল, সূক্ষ্ম চিন্তার বাহক এবং রঙ্গরস মিশ্রিত। পড়লে তৎক্ষণাৎ অর্থ বোঝা যায় না, বারবার পড়তে হয়। প্রতিটি শব্দের ভেতরে যেন জাদু আছে। এটা যেমন কলমকুমার মজুমদারের গদ্যভাষার গুণ, আবার দোষও বটে। আমাদের ধারণা, ভাষার এই কাঠিন্য বা দুর্বোধ্যতার কারণে তিনি ব্যাপক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। একই সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিষয়ভাবনা, ভারতীয় লোকঐতিহ্যের নান্দনিক জীবনদৃষ্টি থাকাসত্ত্বেও তাঁর কোনো উত্তরসূরি, অনুগামী নেই; থাকা সম্ভবও ছিল না। ২০১৪ সাল ছিল কমলকুমার মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী। কমলকুমার মজুমদারের জন্মবর্ষ উপলক্ষে সম্প্রতি বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, থেকে প্রকাশিত হয়েছে '*কমলনামা*' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ প্রজন্মের একজন কথাসাহিত্যিক সদ্যপ্রয়াত কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর (১৯৬৩-২০১৫)। এ গ্রন্থে কমলকুমারের সার্বিক সাহিত্যবৈশিষ্ট্য, শিল্পদৃষ্টি, মানসপ্রবণতাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর দীর্ঘদিন ধরে কমলকুমার চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কোনো অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন বা ডিগ্রির উদ্দেশ্যে নয়, একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহে কমলকুমারের সাহিত্যপাঠ, তত্ত্বানুসন্ধান, পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন শিরোনামে তেরোটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাপত্র বলতে যা বোঝায়, টীকা-ভাষ্য, তথ্যপঞ্জি, উদ্ধৃতি-উল্লেখে আকীর্ণ; কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের প্রবন্ধগুলোতে তা একেবারেই নেই। কমলকুমার মজুমদারের গল্প-উপন্যাস পড়ে তিনি

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

যা উপলব্ধি করেছেন, সেভাবেই তাঁর সৃষ্ট নান্দনিক ভুবনকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন তিনি। ফলে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের লেখাগুলোতে একটা মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক নতুন কথা, প্রথাগত চিন্তার বাইরে নবতর পরিচর্যার একটা ছাপ রয়েছে তাঁর লেখায়, বাক্যে, বর্ণনায়।

সূচিপত্রে প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হচ্ছে ১। 'কমলের জীবন, কমলের সাহিত্য'; ২। 'লীলায় দ্রোহে কমলকুমারের উপন্যাস'; ৩। 'গল্পের কমলকুমার : লোকায়ত দ্রোহের মায়াবী বাউলিয়ানা'; ৪। 'আসুন, আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করি এবং এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলি'; ৫। 'অন্তর্জলী যাত্রার সঙ্গ, নিঃসঙ্গ, প্রতিসঙ্গ'; ৬। 'শবরীমঙ্গল কথা'; ৭। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুককথা'; ৮। 'গোলাপ সুন্দরী: কথাই যখন গোলাপের সৌন্দর্য'; ৯। 'মায়ারও যে জন্মান্তর হয়'; ১০। 'সৌন্দর্য, স্বাধীনতা কিংবা পমেটম কথা'; ১১ 'দীর্ঘ শ্বাস বয়ে বেড়ানো উপন্যাস'; ১২। 'নামহীন গোত্রহীন মানুষের দুর্ভিক্ষ কথা'; ১৩। 'মানব পূজারি কমলকুমার'। প্রবন্ধগুলোর শিরোনামের মধ্যে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের অনুসন্ধান, আবিষ্কার, অবলোকনের দিকগুলো কী? তিনি কী খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সাধারণত, প্রবন্ধ বা গবেষণামূলক গ্রন্থে লেখকের একটা ভূমিকা বা 'প্রসঙ্গকথা' থাকে কিন্তু '*কমলনামা*' গ্রন্থে লেখকের কোনো বক্তব্য নেই।

'কমলের জীবন, কমলের সাহিত্য' প্রথম লেখাটির শিরোনাম অনুযায়ী পাঠকের প্রত্যাশা, এতে পাওয়া যাবে হয়তো কমলকুমার মজুমদারের ব্যক্তিজীবনের সার্বিক তথ্যপঞ্জি, ঠিকুজি, সাহিত্যরচনা সম্পর্কে বিস্তারিত নেপথ্যকথা। কিন্তু কামরুজ্জামান প্রথাগত জীবনী লেখকদের মতো করে তা পরিবেশন করেননি, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কমলকুমারের জীবনী লিখেননি; সেই অর্থে বর্ণনা করেছেন অনেকটা কাহিনিকারের মতো, গল্পের ঢঙে –

> আমরা কথা শিল্পী কমলকুমার মজুমদারকে স্মারণ করছি, তাঁর জীবন আর সাহিত্যযজ্ঞে নিমগ্ন হচ্ছি। তিনি যে জন্মেছিলেন তাতে শতবর্ষ পার হয়েছে-তাঁর এ স্মৃতির ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের কাছে অপরিহার্য সত্তা রূপে বিরাজ করছেন। (পৃ. ৯)

কমলকুমার নিজে যেমন সৃজনকর্মে প্রথাগত ধারা বা স্টাইলকে মান্য করেননি, কামরুজ্জামানও তেমনি কমলকুমারের জীবনীকে সেভাবে সন-তারিখ, স্থান-কালের প্রথাগত ধারায় উপস্থাপন না করে বিভিন্ন উপ-শিরোনাম দিয়ে আলো ফেলেছেন জীবন ও সৃজনকর্মের ওপর। 'যে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠান বিমুখতা থাকে', 'কমল পাঠ', 'কমল বাসনা', 'রূপে রূপের ফেরিওয়ালা', 'নারীর বিপ্রতীপ অবয়ব', 'কমলের ভাষা', 'কমল সৃজিত রং', 'কমল-সৃজিত মৃত্যু', 'তাঁর ধর্ম', 'শিল্পী কমলকুমার', প্রভৃতি উপ-শিরোনামে ভাগ করে বিভিন্ন প্রসঙ্গকে তিনি ডুবুরির মতো তুলে ধরেছেন। যেমন—

> কলকাতার ভিড়বাট্টা নয়, গঙ্গাতেই তিনি নিমগ্ন থাকতে চেয়েছেন। শহরের মধ্যবিত্ত নয়, রিখিয়ার সাঁওতালরা যেন তার অন্তর জুড়ে থাকল। তিনি এমন এক জগৎ নির্মাণে মত্ত ছিলেন, যার কোনো ফলোয়ার ছিল না। বড় কাগজে তিনি লিখেছেন, এমনকি আনন্দবাজারে তাঁর লেখা আছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটুকু জায়গা যেন ছোটকাগজই দখল করে রেখেছে। তিনি প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়া (যেটুকুই পড়েছেন আর কি!) করলেন, অথচ তাঁর অন্তর দখল করে আছে পড়াশোনা না জানা রামকৃষ্ণ। (পৃ. ১১)

আমরা দেখতে পাই কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কমলকুমার মজুমদারের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাঁর বাসনা, সৃজিত ভুবন, ভুবনের রং-রূপ, নারীর অবয়ব, সৌন্দর্যচেতনা, সংস্কৃতিবোধ, ধর্মদৃষ্টি, জীবন-মৃত্যু, শৈল্পিকতা – সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেখেছেন। কমলকুমার মজুমদারের মানসপ্রবণতার সূত্রগুলো এভাবে খুলে মেলে ধরতে চেয়েছেন কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর। এটা কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের নিজস্ব একটা স্টাইল। সেটা অভ্যস্ত পাঠকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তবু এই স্টাইলকে তিনি উৎকৃষ্ট মনে করেছেন। পাঠক হিসেবে আমার কাছেও এই স্টাইল মন্দ লাগেনি। 'লীলায় দ্রোহে কমলকুমারের উপন্যাস' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে কমলকুমারের আটটি উপন্যাস *অন্তর্জলী যাত্রা*, *শবরীমঙ্গল*, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*, *গোলাপসুন্দরী*, *অনিলা স্মরণে*, *সুহাসিনীর পমেটম*, *শ্যাম-নৌকা*, *খেলার প্রতিভা*-র কাহিনি বিন্যাস, বিষয় নির্বাচন, জীবনদৃষ্টি, ধর্ম ও লোকবিশ্বাসের জায়গাগুলোতে পরিচর্যা করেছেন, শৈল্পিক দ্রোহের দিকগুলোকে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। কমলকুমারের নিমগ্ন পাঠক ছাড়া আসলে এদিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো পাঠক হয়তো দু একটি বিষয় চিন্তা করেছেন। কিন্তু এভাবে প্রত্যেকটি উপন্যাস ধরে ধরে মূল জায়গাগুলোতে আলো ফেলা, সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। যেমন : *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* এক পাখির গল্প মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এর মূল চরিত্র সুঘরাইয়ের জীবনের নানান স্তরের ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক জীবনের নানান আবহ আমরা বুঝতে থাকি। জীবনকে এ ধরনের মুক্ততার ভেতর দিয়েই কমলকুমার আমাদের এ জগতের নানান অর্থ, বর্ণ, রূপ চেনান।

*অনিলা স্মরণে*র কথা মনে করা যাক, আমাদের মনে হবে অনিলাকে আমাদের কেবল স্মরণ করতে হয়। কিন্তু অনিলা তো তার বাবা আর মায়ের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সে তার বাবাকে একেবারে জৈবিকভাবেই পছন্দ করে। তাই তার মা কর্তৃক অন্যজনকে ভালোবাসার বিষয়টা সে মানতে চায় না। সে তার জীবনকে বিনাশের পক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা এক জীবনগ্রাসী অনিলাকে স্মরণ করতে করতে তার মায়ের জৈবিকতাকেও স্মরণ করি। আমরা জৈবিক স্মরণকেই আসলে গ্লোরিফাই করি। আমরা *গোলাপ সুন্দরী*র কথা মনে করতে করতে আসলে প্রেমজ জীবনকেই জীবনের সর্বস্তরের

সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। বিলাস টিবি স্যানিটারিয়াম থেকে বাসায় গিয়ে গোলাপের চাষ করে। এমন এক গোলাপের প্রত্যাশী সে হয়, যেখানে এক সুন্দরী আসবে। সে মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলবে না বা বলা লাগবে না, কারণ তার এভাবে তথায় আসার ফলে এক গোলাপ ফুটবে। তাতেই ভালোবাসার কথা বলা হয়ে যাবে।' (পৃ. ৩৬)

কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর এভাবে, পথ খুঁড়ে এগুতে থাকেন কমলকুমার-সৃজিত শিল্পভুবনের গলি পথে। যদিও তাঁর ভাষা, বাক্য গঠন, বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা গল্পের মতো। প্রবন্ধের গদ্যভাষা বক্তব্যপ্রধান হয়ে থাকে। অভ্যস্ত পাঠক প্রবন্ধে সেটাই প্রত্যাশা করে। ব্যক্তিগত জীবনে কথাসাহিত্যের লোক বলেই হয়তো কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর প্রবন্ধে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন গাল্পিক গদ্য ভাষা। অ্যাকাডেমিক পাঠকদের তুলনায়, সাধারণ পাঠকদের কাছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

'গল্পের কমলকুমার লোকায়ত দ্রোহের মায়াবী বাউলিয়ানা' শিরোনামের লেখাটিতে মূলত গল্পের শৈল্পিক কারুকাজ, আঙ্গিকগত দ্রোহিক দিকগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। লেখাটির প্রথম বাক্য- 'ছোটগল্পের জগৎকে যে কজন তাঁদের তেজময় স্নায়ুর উত্তাপে নিরন্তর প্রাণবন্ত রেখেছেন, কমলকুমার মজুমদার তাঁদের প্রথম সারির সিদ্ধিজন।' অর্থাৎ বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকবদল স্মরণ করে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কমলের গল্পগুলোর অভ্যন্তরীণ শিল্পকৌশল, ছোটগল্পের জমিনে কমলের অবস্থানকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কমলকুমার মজুমদার ৫০টির মতো ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি। কামরুজ্জামান লিখেছেন—

> 'মল্লিকা বাহার' গল্পটির কথাই ধরা যাক, মনে হবে এ যেন নগর সভ্যতায় বয়ে চলা একালের এক ভাসান যাত্রা, সেখানে এ সময়ের বেহুলারূপী মল্লিকা ঘাটে ঘাটে নাও ভেড়াচ্ছে। গল্পের শুরুর লাইনটি এ রকম–
>
> 'আয়নায় এখন, আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত এবং অতীব স্পষ্ট।'

বাক্যটি প্রতি মুহূর্তেই যেন গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাচ্ছে। অসম্পূর্ণ, অনেকটা খাপছাড়া। মানে বলতে চাচ্ছি, কমলকুমার পাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। বাক্যটি এমন দাঁড়ায়–

> আয়নায় নিজেকে দেখার ভেতরেই মল্লিকা আঁচলে মুখ মুছছে এবং তাতেই তার মুখটি স্পষ্ট হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাঠক গল্পটি তার মানসিক শক্তি, মেধা দিয়ে হয়ত বাক্যটি কিংবা দৃশ্যটি নির্মাণ করেছেন। এখানে লেখক পাঠককেও কিছু দায়িত্ব দেন। পাঠকও এখানে সৃজনশীল। একজন সৃজনশীল পাঠক কমলকুমারকে বোঝার জন্য পথটি তৈরি করে থাকে। (পৃ. ৫০)

জাহাঙ্গীরের এই বিশ্লেষণ, পাঠক হিসেবে তার প্রাগ্রসর চিন্তারই প্রতিফলন। কমলকুমারকে বোঝা বা জানার, উপলব্ধি করার এই যে প্রক্রিয়া, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের তা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত। প্রবন্ধের শিরোনামে 'মায়াবী' এবং 'বাউলিয়ানা' শব্দ দুটি তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কমলকুমারের 'দ্রোহের' মধ্যেও 'মায়া' লুকানো আছে এবং তা উদাসী বাউলের মতো লিপ্ত ও সম্পৃক্ত থেকেও যেন নির্লিপ্ত সংহত। লেখক বা শিল্পী হিসেবে এখানে কমলকুমার মজুমদারের স্বাতন্ত্র্য। এ প্রবন্ধের শেষে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের কয়েকটি সমীকরণ চোখে পড়ে–

> ১. তিনি একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যিনি অতি সযতনে রবীন্দ্রনাথকে পরিহার করে গেছেন। একটি ভাষাশৈলী আর আলাদা জগৎ তৈরির জন্য নয়, তার চেয়ে বড় কথা তিনি রবীন্দ্রনাথদের ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রহ্মের চিন্ময়ী সাংস্কৃতিক রূপকে বাদ দিতে চিরন্তন চেষ্টা-তদ্বির করেছেন। কারণ তার সাহিত্য চর্চার বহুমুখী প্রচেষ্টার ভেতর একটা ছিল সর্বক্ষেত্রে রামকৃষ্ণকে এস্টাবলিশ করা।
>
> ২. তিনি প্রগতিশীল কিনা, তা এক কথায় রায় দেওয়া খুবই মুশকিল। কারণ তিনি তাঁর লেখা নিয়ে একটা স্পেসিফিক থিমে আটকে ছিলেন বলে ধরা যায় না। 'মতিলাল পাদরী', 'নিম অন্নপূর্ণা'র মতো সাহিত্যিক-আশাবাদের মানবিক গল্প যিনি লিখেছেন। তিনিই আবার 'তাহাদের কথা', 'রক্মিনীকুমার', 'বাগান দৈববাণী', 'ফৌজি-ই বন্দুক'র মতো প্রতিশ্রুতিশীল জীবনমুখী গল্পের পসরা বসিয়েছেন। ...তাহলে এটাই ধরা যায়, তিনি কখনো নিজেকে একটা ভাবনা বা জাগরণে ষোলআনা নিমগ্ন রাখেননি। কিংবা হয়ত শিল্পের ভুবনের স্বোপার্জিত মুক্তচৈতন্যকে সদাতৎপর রাখতে চেয়েছেন। এভাবেই লোকায়ত দ্রোহের নির্জন ঝাণ্ডা উড়াতে থাকেন তিনি। (পৃ. ৭৫-৭৬)

কমলকুমারের শিল্পবিশ্বাস, দৃষ্টিকোণের পরিচর্যা এভাবে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের কাছে উন্মোচিত হয়। তাঁর এ আবিষ্কার, অনুসন্ধানের সঙ্গে অন্যদের মতের মিল থাকতেও পারে, আবার মতানৈক্য থাকলেও দোষের কিছু নেই।

'আসুন, আমরা তাঁর উপন্যাস পাঠ করি এবং এ সম্পর্কে কিছু কথা বার্তা বলি' এই শিরোনামের মধ্যে কমলকুমারের চারটি উপন্যাসকে আলাদা উপ-শিরোনাম– 'অন্তর্জলী যাত্রার সঙ্গ, প্রসঙ্গ, প্রতিসঙ্গ', 'শবরীমঙ্গল কথা', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুককথা', 'গোলাপ সুন্দরী : কথাই যখন গোলাপের সৌন্দর্য', নামে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্তর্জলী যাত্রায় বৃদ্ধকে সার্বিক সদগতির স্বার্থেই গঙ্গাতীরে নেওয়া হয়। সেখানে শ্মশান আছে, আছে বৈজু চণ্ডাল নামের এক শ্মশানচারী, আছে পূজা-অর্চনার লোকজন, গীত গাওয়ার লোক, জ্যোতিষী অনন্তহরি, কবিরাজ কৃষ্ণপ্রাণ। আছে লক্ষ্মীনারায়ণ, জাতিকুল বাঁচানোর জন্য কিশোরী কন্যা যশোবতীকে মরণাপন্ন বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তবে বৈজুনাথ এমন কথিত কাষ্ঠবিবাহ মানতে পারে না। তার অন্তর পোড়ে। যশোবতীকে সে জীবনধর্মে ফিরিয়ে আনতে চায়। তাকে বাঁচাতে চায়। প্রেম চায়। সীতারাম যখন বুঝতে পারে, বৈজুর সঙ্গে যশোবতীর সম্পর্ক হয়েছে। তখন বউকে গালমন্দ করে।

প্রকৃতিই যেন সমাধান করে দেয়। গঙ্গাস্নানে তারা ভেসে যায়, তবু কোথাও না কোথাও মায়া লেগে থাকে। এভাবে সংস্কারের ভেতর বিরাজ করে এক চমৎকার জৈবিক ভালোবাসার উপাখ্যান। কামরুজ্জামান প্রশ্ন তোলেন, এর মুল চরিত্র কোনটি? সীতারামকে নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান গঙ্গাতীরের অন্তর্জলী নয়। যশোবতীর বিয়ে নয় কিংবা সতীদাহের প্রস্তুতি নয় অথবা নয় শ্মশান ডোম বৈজুনাথের মানবিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা কনে বউয়ের প্রতি অনুরাগই মূল বিষয় নয়। সব কিছুর পরেও আছে সনাতন ধর্মের সংস্কারকে আঘাত করার মানবিক আয়োজন। (পৃ. ৮৩)

কামরুজ্জামান বোঝাতে চান, কমলকুমার মজুমদার অনবরত নিজেকে ভেঙেছেন, ফের ভিন্নমাত্রায় গড়েছেন। তাঁর ভাষার প্রকরণ কৌশল নিশ্চয় জটিল এবং স্বনির্মিত। আলাদা এক বাউলিয়ানা, ধুলিধূসরিত জীবনের প্রতি মমতা গড়ে তুলেছেন। তাঁর বিদ্রোহটা আসলে কোন জায়গায়? আদৌ কি কোথাও পৌঁছতে পারলেন? তাকে কেন পাঠক কষ্ট করে পড়বে? তার ভাষার কি সামাজিক ভিত্তি বা সাহিত্যিক বোধ নেই? এ সব প্রশ্ন সামনে রেখে কামরুজ্জামান কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস পাঠ করতে চেয়েছেন। 'শবরীমঙ্গল কথা' প্রবন্ধে কামরুজ্জামান বলতে চেয়েছেন যে, এ উপন্যাস মূলত জীবনকে খোঁজাখুঁজি করার একটা জার্নি মাত্র। শবরী নামের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভেতর দিয়ে একটা লৌকিক সত্তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মূল চরিত্র মাধালী, অন্য সবাই তার ছায়া, মাধালীর চার পাশে কেবল ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। তারা চরিত্র হতে হতে মাধালীর আশপাশে লাটিমের মতোই ঘোরে। লুহানী, মাকড়ি, সুবাই, অদ্বৈত মিশ্র, পাদরি ফিলিপ এমনকি বোমনিকেও মনে হবে যেন মাধালীকে শান দেওয়ার কাজে ব্যবহার করার কিঞ্চিৎ বিষয় আছে। নিঁখুতভাবে দেখলে টের পাওয়া যায়, প্রত্যেকে সহজাত ব্যক্তি – তবে মাধালীই মুখ্য চরিত্র। ধর্মের কাছে একেবারে পাকাপোক্ত করে নিজেকে বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা লেখক রাখেননি। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের এই বিশ্লেষণ সত্যি তুলনারহিত। 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক কথা' প্রবন্ধের বিশ্লেষণ আরো হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলছেন, কমলকুমারের উপন্যাস পড়া মানে সময়, সংস্কৃতি, বোধ ইত্যাদির সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নেওয়া। কারণ কমলকুমার তাঁর উপন্যাসে সমকালকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ঔপনিবেশিক মনোকামনায় তিনি উত্তর-উপনিবেশকে গোছাতে চেয়েছেন। তাঁকে চিহ্নিতকরণের এটা একটা সূত্র হতে পারে। এই সূত্র ধরে এগুলে মনের অতলে কাঁপন ধরে যাবার মতো অবস্থা হয়। সেই কাঁপনের সমাহারে শৈল্পিক লীলা হয়। মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতির ভেতর আলাদা এক দ্রোহের জন্ম হয়। আমরা জানতে চাই, পিঞ্জরে বসিয়া শুক কি করে? সে কি কাঁদে? হাহাকার করে? হাসে, নাকি রক্তাক্ত হতে হতে কিছু খোঁজে? একটা প্রশ্ন, ভাবমূলক একটা ক্রিয়া আমাদের মনোজগতে ঘুরপাক খায়। আমরা স্থির থাকতে পারি না। আমরা ক্রমশ দেহের জগত ছেড়ে কায়ার জগৎ ত্যাগ করে মায়ার জগৎ খুঁজতে চাই।

আমরা অদ্ভুত এক রহস্যের ভেতর পড়ি। এক শুক পাখি আমাদের কলাজগতের রহস্যের, আরো নির্দিষ্ট করে বললে রূপকথার এক চরিত্র, যে চরিত্র এখানে মানবিক কর্তানির্ভর হয়ে তার মায়া ছড়ায়।

'গোলাপ সুন্দরী : কথাই যখন গোলাপের সৌন্দর্য' প্রবন্ধের শিরোনামের মধ্যেই বোঝা যায় কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর কমলের ভাষার নান্দনিকতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপ প্রভাবিত উপন্যাসের কাঠামোকে মান্য করেননি কমলকুমার। তাই বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মনিকের মতো মানুষের সহজাত যন্ত্রণা দেখাননি। তাঁর ভাষাকে উদ্ভট, নৈরাজ্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর ভাবের আসল স্পিরিট মাটিঘেঁষা। মায়ারও যে জন্মান্তর হয়। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন কমলকুমারের লেখায় যেমন মায়া আছে, তেমনি আছে জন্মান্তরের এক অতিকথন। সৌন্দর্যের আর জীবনের নানান রূপ-অরূপের কথা আছে। আছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব থিম। এসবের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে কমলের সৃজন-ভুবনের মায়ার টান অনুভব করা যায়। 'অনিলা স্মরণে' উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শিরোনাম দিয়েছেন 'দীর্ঘশ্বাস বয়ে বেড়ানোর উপন্যাস'। অনিলার মা লাবণ্য দেবীর সঙ্গে অনিলাকে ঘিরে দীর্ঘশ্বাসময় জীবনের মায়ার খেলা, আমরা এমনই খেলার বাঁধনে আটকা পড়তে পড়তে এ উপন্যাস পাঠ করতে থাকি। লাবণ্য দেবীকে কখনো কন্যার দায়বোধের কাছে, কখনো মৃত স্বামীর স্মৃতির কাছে, কখনো রঞ্জিত চ্যাটার্জীর প্রেমের কাছে সঁপে দিতে দেখি। আমরা শেষ পর্যন্ত অনিলার স্মরণে প্রাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের কাছে যেন নিজেদের আশ্রয় খুঁজি। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর বলতে চান, কমলকুমার ভাষার কাব্যময়তার ভেতর দিয়ে অতি চমৎকার নান্দনিকতার স্বাদ দেন, প্রাণ প্রবাহ আবিষ্কার করে। জীবনের মোহিনী মায়ায়, জীবনের অনেক রূপে, এমনকি জাদুময়তায় আমরা নিমগ্ন হই। *'কমলনামা'* গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধের শিরোনাম 'মানবপূজারি কমলকুমার'। এখানে জাহাঙ্গীরের আপ্তবাক্য প্রণিধানযোগ্য—

> তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা স্মরণ করব, খানিক যাচাই-বাছাইও না হয় করে নেব। কমল কুমার মজুমদারের সাহিত্যসম্ভার থেকে যাই-ই পাঠ করি, তাতে কেবল মনে হয়, বিশাল বাংলার বিশাল ল্যান্ডস্ক্যাপে তিনি প্রকৃতি, মায়া আর স্বভাবকেই এঁকেছেন। তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সমগ্র জীবন, মৃত্যু আর রামকৃষ্ণের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে তিনি আনতে চাইতেন। তিনি নিজে হয়ত রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের বাইরে যেতেও চাননি। নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শান দিয়ে, শিবের মতো শ্মশানচারী না হোকে, খালাসীটোলার নেশাবাহিত জীবন সহযোগে নিজেকে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে, চোখে, নিংড়ে দেখতে চেয়েছেন। (পৃ. ১৩৮)

কমলকুমারের জীবন-যাপন, সৃজন-ভুবন, জীবনের রূপ-লীলা-রহস্য আবিষ্কারের মেধাবী স্মরণ নিবিড়ভাবে পাঠ করে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। তাঁর দেখার মধ্যে গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে; বিশ্লেষণের মধ্যে অভিনবত্ব রয়েছে। কমলকুমারের সাহিত্য সম্পর্কে কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের অনেক মন্তব্যও মৌলিক। কমলকুমার সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা ও অভিযোগের অনেক জবাব *কমলনামা* গ্রন্থে পাওয়া যাবে।